Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

বাদল সরকারের নির্বাচিত নাটকে উদ্ভট হাস্যরসের আড়ালে সমাজবাস্তবতা

শ্রেয়া তালুকদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/21_Shreya-Talukdar.pdf

সারসংক্ষেপ: বাদল সরকার বাংলা নাট্যজগত ও নাট্যমঞ্চে এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন। নাটকে নতুন প্লট ও রীতির নব কৌতূহলের প্রবেশ করিয়ে তাতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কৌতুকনাটক নিয়ে নাট্যজগতে তাঁর পদার্পণ। তারপর 'উদ্ভট' বা 'কিমিতিবাদী' নাটকে হাত দেন এবং সেখানেই স্থির থাকেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে মুক্ত মঞ্চের আবির্ভাব ঘটিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে অন্যমাত্রা দান করেন ও পুরনো ভাবধারাকে মুক্তি দিয়ে নতুন পথের হদিশ দেন।

সূচক শব্দ: উদ্ভট, গতানুগতিক, পরাবাস্তববাদ, অ্যাবসার্ড

১

নাটকের উদ্ভব নাচ থেকে যার ধাতুরূপ 'নৃৎ' প্রত্যয়। নাট্যসাহিত্যের স্বমহিমা, সুনিপুণ আঁচড় বারবার পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাটকের এক নবদিগন্তের সূচনা হয় যার পথিকৃৎ বাদল সরকার। এর ফলে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে বাংলা নাট্যসাহিত্য। এতে যেমন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক দিক নবভাবনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে তেমনি নবনাট্য, গণনাট্য আন্দোলনকে হাতিয়ার করে সমসময়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, বুদ্ধিদীপ্ত চমকে স্বাধীন মানবজীবনে অ্যাবসার্ড নাটকের ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। আর সেখানে চরিত্র বাঁক নিয়েছে প্রতীকের আকারে।

বাদল সরকার বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নবরূপে উন্মোচন করে বিশ্ব-দরবারে স্থান করে দিতে চেয়েছিলেন আর সেইকারণে নাট্যমঞ্চ, পরিবেশনা ও নির্দেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বদল এনেছিলেন। নাটক লেখাই হয় মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য আর সেখানে যদি বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলবন্ধতা থাকে তবে তা আরো পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে সেদিক থেকে বিচার করলে বাদল সরকারের নাটকের মূল কথাই যেন জীবনের কথা যেখানে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মভাবে জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে অভিনয় ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে। তাই পবিত্র সরকার বলেছেন — "আমাদের নজর নতুন করে ফেরানো দরকার। এ নাটকগুলি সমাজ বদলের সহায়ক কিনা, হলে কতটা এবং কীভাবে — এসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বেশিরভাগ নাটকের দর্শন ভারক্রান্ত নয়, ভারাক্রান্ত সম্ভবত ভালো। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে হাস্যরসের সহজ নির্মল যাকে ইংরেজিতে belly-laugh বলে যে একটা ইতিবাচক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ভূমিকা আছে — এ সম্বন্ধে ডাক্তার থেকে দার্শনিক — সকলের একমত। অন্যদিকে বাঙালির সংস্কৃতিতে স্বচ্ছন্দ ও সুরচিত হাসির নাটক আঙুলে গোনা যায়, অনেক বাঙালি অতিরিক্ত গোমড়ামুখো, তার্কিক, তাত্ত্বিক এবং বেরসিক, সে সব কিছুতেই গভীর অর্থ খোঁজে এবং দেশের ও দশের উপকার না হলে শিল্পসৃষ্টিমাত্রেই নিস্ফল — এমন ভাবতে চায় — এ অভিযোগও শোনা যায়।"[১]

নাট্যকার বাদল সরকার ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই নতুন কিছু আবিষ্কারে তিনি বিশেষ মনযোগী ছিলেন। নবরূপে নতুন সংকটের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন 'উদ্ভট নাটক' যা পরবর্তী সময়ে নতুন দিশা দেখায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে। পুরনোকে দূরীকরণ করে নবীন রূপে নাট্যাঙ্গনে পথের অভিসারী এই নাটক। কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হয়েছিলেন বাদল সরকার আর ওই সময় তিনি টাউন প্ল্যানিং, রিজিওনাল প্ল্যানিং নিয়ে পড়াশোনা করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর এই বিভিন্ন বিষয়ে পাড়াশোনার অগাধ জ্ঞান তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যে ঢেলে ছিলেন।

যা পরবর্তী সময়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যকে নতুন তথ্য ও তত্ত্বে আবৃত করতে সাহায্য করে। এছাড়া ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ‘শতাব্দী’ নাট্যসংস্থান প্রতিষ্ঠা করেন আর সেই সুবাদে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেন তখনি মার্টিন এসলিনের ‘Absurd Drama’ বা উদ্ভট নাট্যধারার স্পর্শে আসেন।

২
ঘটনা ও চরিত্রে হাস্যরস

কালজয়ী বাদল সরকার বাংলা নাট্যজগতের একজন আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্যকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালে যে অস্তিত্ববাদী দর্শন, পরাবাস্তববাদ, অর্থহীন জীবনদর্শন স্ফুলিঙ্গ হয় তা থেকেই অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম। ‘অ্যাবসার্ড’ শব্দের অর্থ সামঞ্জস্যবিহীন। তার মূল অর্থ বেমানান, অসঙ্গত, অযৌক্তিকতা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু উদ্দেশ্যহীন, বাস্তবের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, অর্থহীনতা, মানুষের একাকিত্ববোধ, যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলাই উদ্ভট নাটকের মূল উদ্দেশ্য। তা সময়ের কালস্রোতে হাস্যরস সৃষ্টি করে।

‘বড়ো পিসীমা’ (১৯৫৮) নাটকটিতে রাগান্বিত পিসিমা চরিত্রকে কেন্দ্র করে হাস্যরস স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। নাটকটিতে মুখবন্ধ অংশ থেকেই যেন হাস্যরসোচ্ছল কৌতুক দেখা মেলে। স্বয়ং নাট্যকার বলছেন — “‘বড়ো পিসীমা’ রচনার কাল-উনিশশো উনষাটের মাঝামাঝি। স্থান — লণ্ডন।... যদি কোনও সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় এ নাটক মঞ্চস্থ করিয়া ফেলেন, তবে প্রকাশকের ঠিকানায় আমাদের নিমন্ত্রণপত্র দিলে বাধিত হইব। না দিলে, যদি টের পাই, আড়ালে কটুকাটব্য করিতে পারি।”[২]

নাটকের মূল প্লট কলকাতা শহরের আবাসিক ফ্ল্যাট ভীমাপুকুর ম্যান্‌শন্স্। কয়েকজন বাউণ্ডুলে ছেলে এই ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা একটি থিয়েটার দল তৈরি করেছে যার নাম দিয়েছে ‘ভীমাপুকুর ম্যান্‌শন্স্ নাট্যসংঘ’। আর এই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিপত্নীক আধুনিক, আত্মভোলা অধ্যাপক যোগীনবাবু ও তার কন্যা অনু। তাদের ঘরেই এই নাটকের রিহার্সাল চলে। তাদের এবারের নাটক ‘কালবৈশাখী’ যা পরিচালনা করছেন নিতাই। ছয়মাস টানা মহড়া চলার পরে অবশেষে পরশু রবিবার সন্ধ্যায় যা মঞ্চস্থ হবে। কিন্তু শিরে সংক্রান্তির মতো বড়ো পিসিমা পদার্পণ করেন যিনি স্বামীর চাকরিসূত্রে লখনৌ থাকেন। মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে চলে আসেন কলকাতায়। কারণ যোগীনবাবুর স্ত্রী মারা যাওয়ার পড়ে তার দায়িত্ব বেড়েছে ভাইঝিকে সুপাত্রস্থ করার। তিনি টেলিগ্রাম করে জানান সাড়ে সাতটার ট্রেনে হওড়া পৌঁছবেন। কিন্তু আগেই চলে আসেন আর বাড়িতে ফিরেই একদল ভবঘুরে ছেলেদের দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পিসিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে অনু। তাতেও কোনো ফল হয় না।

বড়ো পিসিমা একজন জাঁদরেল মহিলা। তিনি হাতে হাতুড়ি রাখেন। স্বামী বড়ো উকিল তবুও স্ত্রীর সামনে কোনো কথা বলতে পারেন না। এমনকি চুরুট খেতেও ভয় পান। যদি সারাদিনে একের বেশি দুটি চুরুট খান তো তার মহা বিপদ। ধরা পড়ে গেলে বলেন —

> “পিসেমশাই : (তোৎলাইয়া) চু-রুট কিসের? কোথায় চুরুট? কে — কে — কে চুরুট —
> পিসীমা : তুমি চুরুট! গোয়াল ঘরে ধুনো দেবার মতো ঘরের অবস্থা, বলে — কে চুরুট!
> আজ সন্ধের চুরুট বন্ধ তোমার।”[৩]

এহেন বড়ো পিসিমা আসার পড়ে সবার ভয় নাটক অভিনয় হবে কীভাবে? কারণ টিকিট বিক্রি ও মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। তারই মধ্যে তিনি হঠাৎ বলেন শনি-রবিবার দুদিনের জন্য কোন্নগর মধুদার বাড়ি বেড়াতে যাবেন, যা শুনে সবাই বিপদ মুক্ত হয়। তবে তা অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। অনাথ নামে একজন যে নাটকে চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করছে সে পিসিমাকে নাটক অভিনয় হওয়ার কথা জানিয়ে দেয় আর তিনি রেগে গিয়ে অনুকে নিয়ে চলে যেতে চান কোন্নগর। অনু চলে গেলে নাটক বন্ধ হয়ে যাবে। তখন শম্ভু এক বুদ্ধি আঁটে। বলে —

শম্ভু : না যাবে না। তোমার পেটের অসুখ করবে। ভীষণ যন্ত্রণা! বিছানা ছেড়ে নড়তে পারবে না।[৪]

তবু শেষ রক্ষা হয় না কারণ খুকুর মুখে নাটকের সংলাপ শুনে ক্ষেপে গিয়ে অনুকে নিয়ে পিসিমা কোন্নগর চলে যান।

অবশেষে শম্ভু এক নতুন ছক কষে যদি অনুকে নিতাইয়ের স্ত্রী হিসেবে মিথ্যে বিয়ের সার্টিফিকেট দেখায়। তবে স্বামীর অনুমতিকে পিসিমা অস্বীকার করবেন না, অভিনয় করতে দেবেন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে নিতাই ও শম্ভুর মধ্যে বচসা লাগে আর হঠাৎ তারা কোন্নগর থেকে চলে আসে। তারপর অনু জানতে পারে শম্ভু পিসিমাকে নিতাইয়ের সঙ্গে তার মিথ্যে বিয়ের কথা বলবে তখন সে রেগে গিয়ে নিজেই নাটক করার কথা পিসিমাকে জানায় কারণ মন থেকে সে শম্ভুকে ভালোবাসে এবং বিয়ের মিথ্যে কথা রটানো বন্ধ করে। এরপর পিসিমাকে ত্রাণকর্তী বৌদি দুপুরে দোতলায় খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং সবকিছু বুঝিয়ে বলেন তারপর তিনি সন্ধ্যায় নাটক দেখতে রাজী হন। এতে অডিটেরিয়ামের সকলেই আতঙ্কিত হয় একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করে। তবে শেষে পিসিমা নাটক দেখে মুখভরা হাসি দিয়ে হাততালি দিয়েছেন। আর শম্ভু সঙ্গে অনুর বিয়ে মেনে নিয়েছেন। এইভাবে নাটক শেষ হয়।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৫) নাটক দেশভাগের পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বেকারত্ব, নৈতিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র অমল-বিমল-কমল আর এদের সবার থেকে আলাদা ইন্দ্রজিতের ছাত্রজীবনের কথা ও সংসার জীবনে একঘেয়ে মধ্যে দিয়ে হাস্যরস ফুটে উঠেছে। কমল কবিতা লিখতে পছন্দ করে তা নিয়ে বাকি বন্ধুরা হাসি ঠাট্টা করে। তখন কবিতা সম্পর্কে তার যে ব্যাকুল আর্তি তা যেন পাঠক মনে হাস্যরস সৃষ্টি করে — "যদি বুঝতে পার ছিঁড়ে ফেলো। না পারলে মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিও।"[৫]

অন্যদিকে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নিজের জীবনকে উপভোগ করতে চাওয়া ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন ছকের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। সে একসময় ঘর গোড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে যার চিন্তাশীল মনভাবনা বারবার ভাবতো ভালোবাসার মানসীকে হাতের নাগালে পেলে বা বিয়ে করে সংসার ধর্মে ন্যস্ত হলে ভালোবাসা ক্ষীণ হবে। সে বলে — "জানি না। আমি অনেক ভেবেছি। অনেক যুক্তি তর্কের বিচার মনে মনে করেছি। সব কিছুর উত্তর — জানি না। কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। যুক্তি তর্ক আর ভালো লাগে না। কিছু করতেও পারছি না। শুধু ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।"[৬] একসময় সোচ্চার কণ্ঠে নিয়ম ভাঙার কথা বলতো শেষে নিজেই নিয়মের বেড়াজালে আবন্ধ হয়ে যায় —

> "লেখক।। কিসের ভয়ে ?
> ইন্দ্রজিৎ।। অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি।"[৭]

চাকরির জন্য ইন্টারভিউ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার জন্য। অবশেষ যখন তার বন্ধু অমল বলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে স্মার্টলি বলতে হয় যে জানি না, তখন ইন্দ্রজিৎ বলে, আই ডোন্ট নো বলাটা বড্ডো শক্ত। তার জীবনের বদল এই নাটকে আর একটি হাস্যরস সৃষ্টি করে তাই নাটক শেষে ইন্দ্রজিৎ জানায় — "আমার বউ সংসার দেখে। আমি চাকরি করি। আমার বউ সিনেমায় যায়। আমি সঙ্গে যাই। আমার বউ বাপেরবাড়ি যায়। আমি হোটেলে খাই। আমার বউ ফিরে আসে। আমি বাজার করি।"[৮]

'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৭) নাটকে সরাসরিভাবে তেমন হাস্যরস নেই। তবে সীতানাথের চরিত্রের ঘন ঘন পরিবর্তন কোথায় যেনও একটা উদ্ভট হাস্যরস তৈরি করে। নাটকটি শুরু হয়েছে ভবানীপুরের কোনো এক অপ্রশস্ত রাস্তায় কোনো এক পুরনো তেতলা বাড়ির দোতলায় শরদিন্দু ও বাসন্তীর দাম্পত্য জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। ছুটির দিন শরদিন্দু খবরের কাগজ পড়ছে আর বাসন্তী সংসারের কাজে নিমজ্জিত। তা শেষ করে তারা ঘুরতে যাবে বটানিক্যাল গার্ডেনে। হঠাৎ শরদিন্দুর চোখ পড়ে সীতানাথের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আর সেখানেই নাটক নতুন বাঁক নেয়। সেই আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে বাসন্তী গল্প লিখতে বসে। এ যেন গল্পের মধ্যে আর এক গল্প। এক নিষ্ঠুর পিতা যিনি স্ত্রী ও কন্যাকে হত্যা করেছেন এবং চুরির দায়ে জেলে গিয়েছেন আর তার অন্য এক

কন্যা কণার প্রসঙ্গ। কণার বড়োদিদির বেঁচে থাকার জন্য বড্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু অনাহারে মরতে হয়েছে। মেজদি দেহব্যবসা করে খাদ্যের সংস্থা করছে যার জীবন হতাশার অন্ধকারে ধাবিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কণাও সেইপথে হাঁটে। সীতানাথের ঘরের স্ত্রী হয়ে তারই বন্ধু নিখিলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। আর তা মেনে নিতে না পেরে সীতানাথ মৃত্যুকে একমাত্র পথ বলে বেছে নেয়। বাসন্তী তাই বলে — "কণা কাউকেই সত্যি সত্যি ভালবাসেনি। নিখিলকেও না সীতানাথকেও না। ছোটবেলার একটানা দারিদ্র তাকে শুধু একটা জিনিস শিখিয়েছে... দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছে। টাকার লোভ নয় নিশ্চিত আশ্রয়ের লোভ।"[৯]

অ্যাবসার্ড নাটকের মূল উদ্দেশ্য এলোমেলো জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিস্থাপিত করা আর এখানেই নাটকের সার্থকতা। তাই শরদিন্দু যখন সীতানাথকে নিয়ে গল্প লিখতে বসেন তখন দেখা যায় তিনি প্রধান শিক্ষক এম.এ পাশ পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের দায়িত্ব তার উপরে পড়ে। বিয়ের পরে প্রথম মধুচন্দ্রিমায় চম্বলগড় ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানে হঠাৎ তার জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। কন্যা সমান দশবছরের পার্বতীকে নিয়ে জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। ডাকাতের দলের হাতে পড়ে পার্বতী ধর্ষিতা হয় ও মারা যায়। অন্যদিকে সীতানাথ নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। কয়েকবছর পরে আবার তার পার্বতীর কথা মনে পড়ে বিধুভূষণের নাতনি গৌরিকে দেখে। তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে পুতুল ও স্কিপিং রোপ কেনে। কিন্তু অবশেষে স্কিপিং রোপ দিয়েই আত্মহত্যা করেন। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে দেখা যায় বাসন্তী তার পড়ার ঘরে বসে লেখা দেখছে। হঠাৎ সীতানাথের আত্মা এসে তাকে মৃত্যুর মূল কারণ জানায়, সে স্ত্রীকে কত ভালোবেসে ছিল কিন্তু শেষে তাকে ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে শরদিন্দুর কাছে যখন সীতানাথের ভূত আসে তখন সে দেখে তার সঙ্গে সীতানাথের কোনো পার্থক্য নেই – সেই পেপার কাটিং, সমাজে টিকে থাকার লড়াই, বিবাহিত জীবন – একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তখনি সীতানাথ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে অর্থহীন পরিণতি জীবন কাহিনি থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে আর এখানেই হাস্যরস তৈরি হয়। শেষরক্ষে পায় বন্ধুর জন্য –

"শরদিন্দু।। (ধীরে) হয় তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে জানতাম।
সীতানাথ।। (স্নিগ্ধ স্বরে) তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু ?
...
শরদিন্দু ।। তুমি যাও শরদিন্দু।
সীতানাথ।। আমি সীতানাথ।

[সীতানাথ চলে গেলো। মিশে গেলো অন্ধকার। শরদিন্দু স্তব্ধ। টেবিল ল্যাম্পের গুটিয়ে পাকিয়ে রাখা তারটা চোখে পড়লো। যেন নতুন চোখে দেখছে তারটাকে। প্লাগ খুলে হাতে তুলে নিলো তারটা। ল্যাম্পটা নিভে গেলো। একবার ছাদের দিকে তাকালো। গুটি খুললো ধীরে ধীরে।...]"[১০]

'বল্লবপুরের রূপকথা' (১৯৬১) হাস্যরস ও অতিপ্রাকৃত মিশ্রিত একটি নাটক। যেখানে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিকতা ও নব্য পুঁজিবাদের ঠাট্টা রাজ ইতিহাসের টিপ্পনির মধ্যে ধরা দিয়েছে। এই নাটকে অনেকগুলি ঘটনার সমাবেশ ঘটে। যেমন চারশো বছরের পুরনো চোখ ধাঁধানো রাজবাড়ি যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে চোদ্দপুরুষের বিশ্বস্ত চাকর মনোহর, ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত রাজপরিবার, ডাক্তারি পাস করা যুবক ভূপতি, চারশো বছরের অভিশাপ ঘাড়ে নিয়ে রোমান্টিক সাহিত্যপ্রেমী ভূত রঘু। সে রাত এগারোটার পরে মেঘদূত-গীতগোবিন্দ শ্লোক উচ্চারণ করে। সব মিলিয়ে একটা কমেডির পরিবেশ গড়ে ওঠে। এই নাটকে সংলাপগত রদবদল নেই যা আছে তা শুধু মাধ্যমগত বদল। তাই নাট্যকার মুখবন্ধ অংশে বলেছেন – "এই নাটকের মূল রসিকতাটুকুর অনুপ্রেরণা একটি বহু পুরাতন বিদেশি চলচ্চিত্র। কিন্তু গল্পের কাঠামো থেকে শুরু করে নাট্যশৈলী, চরিত্র, সংলাপ সবই স্বকপোলকল্পিত। সে হিসেবে নাটকে বোধহয় মৌলিক বলা চলে।"[১১]

বল্লভপুরের রাজা রায় বাহাদুর ভূপতি গভীর ঋণে জর্জরিত। তাই তিনি কলকাতায় চলে গিয়ে একটা ডেন্টাল ক্লিনিক শুরু করতে চান ধার পরিশোধ করার জন্য এবং পুরনো চারশো বছরের পৈতৃক প্রাসাদটিও বিক্রি

করার চেষ্টা করেন। এরপর ব্যবসায়ী মি. হালদার তার সম্পত্তি দেখতে আসেন তখন ভূপতি স্থানীয় পাওনাদার সাহা, পবন, শ্রীনাথের সাহায্য চান। সেই রাতে মি. হালদার তার স্ত্রী স্বপ্না ও মেয়ে ছন্দাকে নিয়ে থেকে যান প্রাসাদে আর পরিবারের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে সম্পত্তির চেকে সই করে দেন। এরপর ছন্দা ও ভূপতি প্রেমে পড়ে। কিন্তু — সবচেয়ে বড়ো রহস্য যা ভূপতি গোপন করেন তা হলো রঘুপতি ভূতের কথা যে এক অভিশাপে এই প্রাসাদে বন্দী যা সঞ্জীব (ভূপতির সতীর্থ) বিশ্বাস করে না। এরপর রঘু উন্মত্ত হাসির সঙ্গো পুনরায় সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করতে থাকেন। কালিদাসের মন্ত্রমুগ্ধ আবৃত্তি ছন্দোময় হয়ে ওঠে।

অবশেষে ভূপতির সঙ্গো ছন্দাকে দেখে ফেলে স্বপ্না আর রেগে গিয়ে স্বামীকে চুক্তি বাতিল করতে বলেন। এরপর ভূপতি তাদের রঘুর কথা জানান এবং তা শুনে হালদার মশাই বলেন, যদি ভূপতি তার স্ত্রীকে ভূত দেখাতে পারেন তবে তিনি চুক্তির মূল্যের চারগুণ দাম দেবেন। পরেরদিন এক নতুন ক্রেতা আসেন। লোকটি মিস্টার চৌধুরী, তিনি হালদার মশাইয়ের বন্ধু। তিনি বল্লভপুরের রাজপ্রসাদ সম্পর্কে উপহাস করেন। তখন উত্তেজিত ভূপতি রঘুকে ডাকেন। শেষ পর্যন্ত মিস্টার চৌধুরী নতজানু হয়ে রঘুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং রঘুও অভিশাপ মুক্ত হন। স্বপ্না ক্ষমা চেয়ে ছন্দার সঙ্গো ভূপতি বিয়ে ঠিক করেন। তবে নাটক শেষে নবদম্পতি রঘুর কণ্ঠস্বর শুনতে পান। সঞ্জীব বলে —‘কী বলছেন? কবে হোলো? তা ধরুন রঘুদা যাবার মাস ছয়েক পরে। অ্যাঁ? কী করে হোলো? রূপকথার শেষে একটা বিয়ে হওয়া দরকার — হয়েছে, আবার কী করে হলো, কেন হোলো — অতো খোঁজে দরকার কী মশাই? ।”[১২]

‘ভোমা’ (১৯৭৬) নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের নাটক। এখানে শহুরে ও গ্রামীণ জীবনের বৈষম্যময় জীবনচিত্র ধরা দিয়েছে। নাটকের মূল বিষয় সুন্দরবনের ভোমা নামক এক নিরীহ গ্রামবাসীর জীবন। “ভোমার মা মরেছিল সাপের কামড়ে। বাপকে কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে ভোমার চোখের সামনে। ছোট ভাইটা নোনা জলে তেঁতুল মিশিয়ে খাওয়া সহ্য করতে না পেরে পেটের ব্যামোয় গেলো।”[১৩]

এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এতে সম্পূর্ণ চরিত্র নেই। সব সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত দৃশ্যে, ধারাবাহিকতা নেই। কেমন যেন বিক্ষিপ্ত উপস্থাপন, কল্পনা ও অভিজ্ঞতায় পুরো শরীরী কায়দা কানুনের মাধ্যমে তা উত্থাপন করা হয়েছে আর সেখানেই হাস্যরস তির্যকভাবে পড়েছে —

“দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-পাঁচ-ছ । ভোমা কে?

এক। ভোমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু ভোমা আছে! আরো জানি — ভোমা না বাঁচলে, ভোমা না বাঁচলে আমি বাঁচি না আমরা বাঁচি না কেউ বাঁচে না!

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-পাঁচ-ছ । ভোমা কে?

[এক লাফিয়ে উঠে ঠেলে ওদের মধ্যে ঢুকলো]

এক। ভোমা একজন — ভোমা একটা — ভোমা হচ্ছে —

[কিন্তু ওদের চোখে নির্বিকারতা। ‘এক’ হাল ছেড়ে বেরিয়ে এল।]

পারছি না ভোমা। তোমাকে নিটোল ছিমছাম প্রাঞ্জল একটা ফরমুলায় কিছুতেই ফেলতে পারছি না।”[১৪]

‘ভোমা’ যেন সমাজের প্রেমহীনতার ছবি। সেখানে দরিদ্র মানুষের শোষণ, ক্ষুধা, অজ্ঞতা প্রধান বিষয় আর সুবিধাবাদী সমাজ ও শোষক পরিপূর্ণতার প্রতীক রূপে জ্বলে উঠেছে। নিজের সঙ্গীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পিছুপা হয় না। মরচে পড়া কুড়াল হাতে বিষাক্ত গাছের মতো ছেঁটে ফেলে রক্ত ঠাণ্ডা করার পরামর্শ দেয়।

৩

হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে সমাজবাস্তবতা

জীবন ও সমাজের সঙ্গো সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এখানেই তার প্রতিচ্ছবি ও বাস্তব উপাদানের মেলবন্ধন ঘটে। আর সেখানে সাহিত্য এমন একটা দিক যা সমসাময়িক সময়ক্ষণ, মানুষ ও তাদের জীবনের ওঠাপড়া সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। মানুষ সামাজিক জীবন আর তার মনভাবকে গুরুত্ব দেওয়া সমাজের অন্যতম কর্তব্য। সেখানে শুভ ও অশুভ দুই দিকই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য হলো ব্যক্তির সঙ্গো সময় ও পরিসরের প্রতিফলন। নাট্যকার বাদল সরকার সেদিক থেকে সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা উদ্ভট নাটকগুলি সমাজবাস্তবতার দিকে বিশেষ নজির রাখে পাঠক সমাজের কাছে।

'বড়ো পিসীমা' নাটকে সেই সময়ের তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। সেখানে বংশ মর্যাদা, গোঁড়ামি আসল। এই নাটকে আগল ভাঙার সংগ্রাম উঠে এসেছে। সেখানে একদল নারী বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে অন্যদিকে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যোগীন, নিতাই, শম্ভুর লড়াই এই নাটকের আরেকদিক উন্মোচিত করেছে। পিসিমা এখানে সংস্কার আচ্ছন্ন নারীর রূপ যার মধ্যে আছে বাৎসল্য প্রেম, কর্তব্যপরায়ণ বোধ। অন্যদিকে আগল ভেঙে বেরিয়ে আসার নারীর প্রতীক অনু যে সংস্কারকে দূরে রেখে বাস্তবের মাটিতে বসত করতে চায়। এই নাটকে দুই নারীর চিন্তা চেতনার দূরত্ব সমাজবাস্তবতার এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে চরিত্রের মধ্যে সমাজবাস্তবতার বিশেষ দিক ফুটে ওঠে। কলকাতা শহরে কত শ্রেণির পেশার মানুষ আছে যাদের আমরা চিনি বা হয়তো চিনিনা। নাটকটি যেন সময়ের সঙ্গো তাল মিলিয়ে লেখা। অমল-বিমল-কমল-ইন্দ্রজিতের কলেজ জীবনের কথা দিয়ে শুরু। আড্ডার বিষয় — সিনেমা, কবিতা, রাজনীতি, প্রেম। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গো সঙ্গো সেসব ফিকে হয়ে ওঠে। সংসার, বিমা, চাকরি এসবের গতানুগতিক ধারার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

নাটকের শেষে দেখা যায় সব বন্ধুদের থেকে আলাদা থেকেও ইন্দ্রজিৎ যেন আলাদা থাকতে পারে না। একঘেঁয়ে জীবনের ছকে বাঁধা পড়ে যায় আর এখানেই উদ্ভট নাটকের সার্থকতা।

'বাকি ইতিহাস'এর মধ্যে ক্লান্তি, অবসাদ, শূন্যতাবোধ, আত্মহত্যা প্রবণতা প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়েছে। জীবন সম্পর্কে তার যে বিতৃষ্ণা অর্থহীনতা তা প্রকটিত। তাই ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন — "'বাকি ইতিহাসে' যে যৌন বিকৃতি দেখান হইয়াছে তাহাও অ্যাবসার্ড নাটকের একটি লক্ষণ। উদাহরণ স্বরূপ অ্যারাব্যালের 'The Two Executioners' অ্যালবির 'The Zoo Story' এবং কোপিটের 'Oh Dad, Poor Dad' প্রভৃতি নাটকের নাম করা যাইতে পারে। ঐ নাটকগুলিতে স্বাভাবিক সম্পর্কের বিকৃতি এবং অবদমিত বাসনা-কামনার প্রভাব দেখার হইয়াছে।"[১৫]

'বল্লবপুরের রূপকথা' নাটকটি রূপকধর্মী। চারশো বছরের পুরনো রাজবাড়ির ভগ্নস্তূপকে সামনে রেখে বিশুদ্ধ হাস্যরস ও হালকা ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে। ফাঁপা আভিজাত্য কীভাবে মানুষের জীবনযাপনকে জটিল করে তোলে তা স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। অন্যদিকে চারশো বছর ধরে অনর্থক এক অভিশাপ মাথায় নিয়ে বয়ে চলেছেন রঘু যাঁর সঙ্গো যুক্ত আছে রাজবাড়ির বর্তমান বংশধর ভূপতির ক্রাইসিস। তিনি অভিজাত্য থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো চলতে চান। আর মনোহর তিন পুরুষ ধরে রাজার বাড়িতে খাস হয়ে থাকার জন্য তার ঠাট বজায় রাখতে চেয়েছে।

নাটকটি জুড়ে সূক্ষ্ম ভাবে অতীত ও বর্তমানের ভারসাম্য প্রতীয়মান হয়েছে। শ্রীনাথ চরিত্র যেন সেই মানুষের প্রতিনিধি যে নিজের ক্ষতি বুঝেও আনুগত্যজনিত নিরাপত্তা হারানোর ভয় পায়। আর এসব মিলিয়ে একটা হাস্যরসের পরিবেশ ও সমাজবাস্তবতার নতুন আঙ্গিক ধরা পড়েছে।

'ভোমা' এক শূন্যতার প্রতীক। সে পৃথিবী, মাতা ও জলের দেবতা বিষ্ণু পুত্র। মানবতা, মৃত্যুর ও ঠাণ্ডা

রক্তের প্রতীক। নাটকে প্রতীক অর্থে ‘মরচে কুড়াল’এর কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা বিষাক্ত গাছগুলো ধ্বংস করা হয়; সে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের প্রতীক অস্ত্র যা সহজে ধ্বংস হয় না।

নাট্যকার এই নাটকে দরিদ্র কৃষক জীবনের অস্তিত্ব সংগ্রামের কথা বলেছেন। খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের রূপ ভোমা। সে সারাদিনে একবার মাত্র ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, স্যামসাং ব্ল্যাকবোর্ড শোষণের শিকার। তাদের লোন নেই, পাম্প নেই, সেচ, চাষাবাদ নেই; যারা দিনের শেষে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। এখানে হাস্যরসের মধ্যে এই সমাজবাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

বাদল সরকারের লেখা অ্যাবসার্ড নাটকে যেভাবে উদ্ভট তত্ত্ব স্থান পেয়েছে তা অনন্যতার অধিকারী। তাঁর নাট্যবিশ্লেষণ, উপস্থাপনা, নির্দেশনা তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে বারবার ফুটে উঠেছে। আর এখানেই তিনি নাট্যচরিত্র নির্মাণ ও প্রতীকের মধ্যে দিয়ে নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছেন যা বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিরল। সেইদিক থেকে বিচার করলে তিনি অন্যান্য নাট্যকারের থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী আর এখানেই তাঁর সার্থকতা। সেইজন্য পাঠক ও অভিনেতা সমাজ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সাক্ষী হয়ে থাকতে পেরেছে তাঁর নাটকের হাত ধরে।

তথ্যসূত্র :

১. ‘নাটক সমগ্র’ (প্রথম খণ্ড), বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ৩
২. ওই, মুখবন্ধ
৩. ওই, পৃ. ৫৯
৪. ওই, পৃ. ৫৫
৫. ওই, পৃ. ২৬৪
৬. ওই, পৃ. ২৭৯
৭. ওই, পৃ.৩০৪
৮. ওই, পৃ.৩০৯
৯. ‘নাট্য সঙ্কলন’ বাদল সরকার, বাউলমন প্রকাশন ৩৪ সেন্টাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর, কলকাতা ৩২, বইমেলা, জানুআরি ২০০১, চতুর্থ মুদ্রণ জানুআরি ২০১১, পৃ. ২৬
১০. ওই, পৃ. ৬৩
১১. ‘নাটক সমগ্র’ (প্রথম খণ্ড), বাদল সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৯, মুখবন্ধ
১২. ওই, পৃ. ৪৪৮
১৩. ‘ভোমা’ বাদল সরকার, নব গ্রন্থ কুটির ৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, শ্রাবণ ১৩৮৭, পৃ. ৫১
১৪. ওই, পৃ. ৩১
১৫.‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, ড.অজিতকুমার ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা জানুআরি ২০০৫, মাঘ ১৪১১, পৃ. ৪৩১

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাদল সরকার, ‘নাটক সমগ্র’ (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৪০৯
২. বাদল সরকার, ‘নাট্য সঙ্কলন’, বাউলমন প্রকাশন, ৩৪ সেন্টাল রোড (রামঠাকুর সরণি), যাদবপুর, কলকাতা ৩২, চতুর্থ মুদ্রণ জানুআরি ২০১১
৩. বাদল সরকার, ‘ভোমা’, নব গ্রন্থ কুটির ৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৭
৪. অজিতকুমার ঘোষ, ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ

কলকাতা বইমেলা, জানুআরি ২০০৫, মাঘ ১৪১১

৫. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', রত্নাবলী ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৯, শ্রাবণ ১৪০২/ অগস্ট ১৯৯৫

৬. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, জানুআরি ২০০৩, মাঘ ১৪০৯

৭. পবিত্র সরকার, 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ' (অখণ্ড সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১৬, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

বৈদ্যুতিন সূত্র :

https://bn.m.wikipedia.org

লেখক পরিচিতি : শ্রেয়া তালুকদার, পিএইচ.ডি গবেষিকা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।